The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.1 - 14)
Published in February, 2025

বাঙালি মননে সুফি প্রভাব

ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: সুফিবাদ ইসলামের মরমী গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং পবিত্র কুরআন হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দার্শনিক মতবাদ। আধ্যাত্মিক সত্যের পথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুফিবাদের উদ্ভব। এ মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞান বা উপলব্ধি বলতে ঐশীপথ নির্দেশক আত্মোপলব্ধিকে বুঝানো হয়। যেসব ধ্যান-ধারণা নিয়ে ইসলামের ইতিহাসে সুফিবাদের আবির্ভাব, সেগুলোর মর্ম ও নির্যাস কুরআন ও হাদিসেই নিহিত। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, *কুরআনের* সঠিক অনুশীলন এবং এ নিয়ে গভীর ধ্যান-অনুধ্যান থেকেই ইসলামী মিস্টিসিজম বা মরমীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানসহ সুফিদের অনুসৃত যাবতীয় অনুশীলন কুরআনের পারলৌকিক ও অনুধ্যানিক দিক থেকেই উদ্ভুত। হাদিসে উল্লেখ আছে, "আল্লাহকে তোমাদের এমনভাবে উপাসনা করা উচিত যেন তোমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ।" জগতে নিজেদের নিছক আগন্তুক বা পথিক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য মুসলমানদের প্রতি মহানবী (স.) নির্দেশ এবং শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের বাইরেও ধর্মের আরও একটি অতিরিক্ত উৎকর্ষের (ইহসান) দিক রয়েছে বলে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, যা সুফিবাদের প্রতি মহানবী (স.) এর সমর্থনের ইঙ্গিত বহন করে। সুফিবাদ বলতে আমরা জীবন ও মূল্যবোধ বিষয়ক এমন একটি আদর্শকে বুঝব যা *কুরআন* ও *হাদিসে* উপস্থাপিত এবং যা মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ সেই আদর্শ থেকে বিকশিত। একথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনে বিধৃত মূল্যবোধের মৌল ধারণাবলি সুফির জীবনী ও কর্মে প্রতিফলিত যা সাধারণ মানুষের জীবন ও মূল্যবোধবিষয়ক মৌলিক আদর্শকে নির্দেশ করে।

১.১. ভূমিকা:

কুরআনের নীতি ও শিক্ষার ওপর ইসলামি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে মহান আল্লাহপাক মানুষের জন্য যে আদর্শ আচরণবিধি উপহার দিয়েছেন, তাই পরিচিত 'শরীয়ত' নামে। শরীয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা, যাতে রয়েছে মানুষের গোটা জীবন ও কর্মকাণ্ডের সঠিক দিক নির্দেশনা। মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক, পার্থিব ও ধর্মীয় দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং শরীয়তের লক্ষ্যই হলো এ দুটি দিককে একতাভুক্ত করে মানব জীবনের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সুরক্ষা করা। বাঙালির কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন এমনকি রাষ্ট্রীয় চিন্তা-চেতনায় সুফি প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রাম বা শহর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সুফিদের আগমন ঘটেনি বা তাঁদের মাযার শরীফ গড়ে ওঠেনি। ইসলামের ন্যায় ও সুনীতিভিত্তিক সুষম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া এবং ইসলামী আকীদা মোতাবেক ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের পথ অনুসন্ধান চালানো সুফিদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, সুফিদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র 'খানকা'র আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বাংলার ঘরে-ঘরে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় এঁদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মত। কালেরপ্রবাহে সুফি ভাবধারার সাথে এ দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এমনকি দর্শনের একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছে যা এ দেশের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির ওপর প্রভাব ফেলেছে ব্যাপকভাবে। সুফিগণ ইসলামের সূচনাকাল থেকেই কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছেন এবং তদানুযায়ী নিজেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় মগ্ন থেকেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিবিচার ও

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর *কুরআন* ও *হাদীসে* যে দ্ব্যর্থহীন তাগিদ দেয়া আছে সুফিগণ সে মতে পুরোপুরি আস্থাশীল থেকে সাধারণ মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন। এ সব মহা- মনীষীর অনুসৃত নীতি, পথ ও আদর্শ সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সুফিগণ আল্লাহকে চেনা, জানা ও তাঁর নিকটবর্তী হবার তাগাদা নিজের মধ্যে অনুভব করেন এবং তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম অনুসন্ধান করেন (আরো দেখুন-সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৩৫)। এ লক্ষ্যে সুফিগণ ভারতীয় উপমহাদেশসহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইসলামী আকীদা প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং খোদার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। কুরআন, রাসুল (স.) এবং পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) এর শিক্ষার মধ্যেই সুফিবাদের মূল অঙ্কুর নিহিত। সুফিবাদের উৎপত্তির ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে, হিজরির প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সুফিবাদের বীজ বপন করা হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে বর্তমানে মানবতাবাদী দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সুফিদের মানবতাবাদী আদর্শের কারণে তাঁদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এ অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সুফিদের কদর করেন, তাঁদের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সুফি ভাবধারা বাঙালির সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনমান উন্নয়নসহ দৈনন্দিন কাজকর্মে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সুফিবাদ কথাটির সরল অর্থ হচ্ছে 'ইসলামী মরমীবাদ' ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ইসলামিক মিস্টিসিজম'। ইসলামের দুটি দিক যথা- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন। প্রথমটি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্বলিত এবং পরেরটি তরিকতের বিধি-বিধান সম্বলিত। ইসলামের অভ্যন্তরিন দিককে বলা হয় 'তাসাউফ', যা ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় বহন করে। এই তাসাউফ তত্ত্বকেই বলা হয় সুফিতত্ত্ব বা সুফি দর্শন। সুফিবাদ *কুরআন* ও *হাদিসের* নির্যাস থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি আল্লাহর পথে সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করার একটি সহজতর পথ মাত্র *(আরো দেখুন-আল-কুরআন, ২৫:৬৯; ৫৩:৫৭)।* এর চর্চা, অনুশীলন এবং প্রয়োগ মূলত নবী-রাসুলদের মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কালক্রমে এ ভাবধারা বাংলাদেশেও অনুপ্রবেশ ঘটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে প্রবর্তিত ও প্রচারিত সুফিবাদ মূলধারার ইসলাম থেকে অনেকটা সরে গেছে। পবিত্র *কুরআন* ও *হাদিসের* শিক্ষা গ্রহণ করে সে আলোকে জীবন গঠন ও ধর্মাচার পালনের সাথে সাথে দেশীয় নানান আচার ও অনুষ্ঠানাদী যুক্ত হয়েছে এ অঞ্চলের সুফিদের কর্মকাণ্ডে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ অঞ্চলের অনেক সুফি-সাধক ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এ দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতাকে লালন করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষ, তাঁদের কর্মকাণ্ড খোদাপ্রেমের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সুফিদের আস্তানায় আগত ভক্তদের কর্মকাণ্ড যেমন, কবরে সিজদাহ করা, বিভিন্ন ধরণের মানত করা, গুরুর (সুফি) সান্নিধ্য লাভে উপোস (না খেয়ে) থাকা, রোগ-ব্যাধি, মহামারি থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে গুরুর মাযারে বিভিন্ন উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড মূল ইসলামিক সুফি ভাবধারা থেকে আলাদা। অর্থাৎ এ অঞ্চলে অনুসৃত সুফি অনুসারীদের এ সব কর্মকান্ড সুফিবাদের মূল শিক্ষা থেকে অনুসৃত নয়। বর্তমান প্রজন্মের উচিত সুফিবাদের মূল উৎস *কুরআন* ও *হাদিসের* মূল শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করা; যাতে করে মানুষ খোদাপ্রেমে মশগুল হয়ে আল্লাহর সাথে মহামিলন ঘটাতে পারেন। এ দর্শন এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে এ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অনাড়ম্বর, বিলাসী জীবন পরিহার এবং ইহজাগতিক অনাসক্তির প্রতীক 'সুফি'দের প্রভাব বাঙালির সমাজ জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। সুফিদের সমাজ ভাবনার ফলে ব্যক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা,

দর্শনচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সূচিত হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। সুফিগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি মননে যে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন যা এ অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলছে বলে সুধী মহল মনে করেন।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, সুফিদর্শনের উপর বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method)'র সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. সমকালীন বিশ্ব সংকট ও সুফিবাদঃ

সমকালীন বিশ্বজুড়ে যে বহুমাত্রিক সংকট বিরাজ করছে তার মূলে যতটা না আর্থ-সামাজিক কারণ রয়েছে তার চেয়ে দার্শনিক চিন্তার দৈন্যই বেশি দায়ী বলে মনে করা হয়। কারণ বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করছে দর্শনহীনতা। সমাজজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সমগ্র উপলব্ধিতে দর্শনহীনতা কাজ করছে যুগপৎভাবে। মানুষের মানবিক ও নৈতিক চেতনার উন্মেষে সুফি নির্দেশিত মত ও পথের কোনো বিকল্প নেই। এ পথ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্তা বহন করে; সুফিবাদই মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেমের প্রধান শক্তি বলে বিবেচিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, মানব মনের আনন্দানুভূতি ও প্রশান্তি জাগাতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন দার্শনিক মানসিকতার পরিচর্যা তথা সুফি দর্শনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো। সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত ও আধ্যাত্মিক মরমী প্রবনতার এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। অন্তরের অনুভূতির মাধ্যমে পরমসত্তাকে জানার অদম্য স্পৃহাই সুফি দর্শনের মূলসুর। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই এ দর্শনের মূল কথা। সুফিদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার অগ্রগতির সাথে সাথে মানবিক ও নৈতিক উন্নয়নকেও প্রাধান্য দেয়া হয়, যা বাস্তবিক ও সার্বজনীন মানবকল্যাণ হিসেবে স্বীকৃত। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, কলুষমুক্ত আদর্শ ও নৈতিক চেতনাময় জীবন গড়ে তোলার উপর এ দর্শন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, বাংলা ভূ-খণ্ডে সুফি-দরবেশদের আগমন ঘটেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত সাহাবীগণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে অসংখ্য সুফি-দরবেশ আরব, পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে শুধু ইসলাম প্রচারের মহতী আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে স্বদেশ ও স্বজনদের মায়া ত্যাগ করে অচেনা অজানা দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের অনেকেই এসে পৌঁছেছিলেন আমাদের এ ভূখণ্ডে। পরবর্তীতে এসব গউস, কুতুব, সুফি, অলি-আউলিয়াদের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ অঞ্চলের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষ সুফি ভাবাদর্শে পেয়েছে সাম্য, শান্তি, উদারতা ও মানবিকতার উজ্জ্বল আদর্শ। এভাবে সুফিরা ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের নানাবিধ কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিয়ে অতি সহজেই তাদেরকে আপন করে নিতে পারতেন। বিনিময়ে সাধারণ মানুষও এসব মনীষীর ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও দর্শন গ্রহণ করে তাঁদের দেখানো জনকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা তথা মানবকল্যাণের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। সুফিদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার ফলে কীভাবে এদেশের মানুষের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তার প্রাতিষ্ঠানিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী জুড়ে যে নানাবিধ সঙ্কটের

কথা বলা হচ্ছে, যে নামেই এসব সঙ্কটকে অভিহিত করা হোক না কেন এবং তা যেকোনো পরিসরেই হোক না কেন তাকে আমরা চিন্তার দৈন্য বা দার্শনিক দারিদ্র্য বলেই অভিহিত করব। এ দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়েই সমকালীন মানুষ তার নিজেকে অন্তঃসারশূন্য, বিবেকশূন্য অপ মানুষে পরিণত করছে। আর এ কারণে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র লক্ষ্য করছি শূন্যতার অন্তর্জ্বালা। এ বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি স্তরে সুফিতাত্ত্বিক মানসিকতার অনুশীলন। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক সম্প্রীতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুফি প্রবর্তিত দর্শন হতে পারে একমাত্র পাথেয়।

প্রথাগত উদ্দেশ্যবাদ কিংবা উপযোগবাদী দর্শন এ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা ইতোমধ্যে বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ উদ্দেশ্যবাদ কিংবা উপযোগবাদী দর্শনে আমরা লক্ষ্য করি মানবজীবনকে বিধিবদ্ধ শর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্যবাদ নিরেট বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে প্রলুব্ধ করে মানুষকে ইচ্ছাবৃত্তির দাস বানিয়ে রাখে। আর উপযোগবাদ ভোগ ও সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চকরণের প্রয়াসে মগ্ন থাকে। এভাবেই মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে ইচ্ছা ও কামনার বেড়াজালে। অথচ, নতুন নতুন আশা-আকাঙ্খার প্রত্যাশায় আমাদের উদ্দীপ্ত হওয়া উচিত। উপযোগবাদ তথা উদ্দেশ্যবাদের দুই শৃঙ্খলে তা অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃতি ঘটছে বি-মানবিকীকরণের। আর সমকালীন এ বৈশ্বিক সংকটের পেছনে কাজ করছে এই বি-মানবিকীকরণ। এই বি-মানবিকীকরণের প্রয়াসে রয়েছে ক্ষমতার অভীপ্সা। সুফিবাদ আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি অনুশীলনের মাধ্যমে এই বি-মানবিকীকরণের রোষানল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম।

১.৫. বাঙালির ভাবাদর্শে সুফি দর্শন:

বাংলাদেশ পীর-আউলিয়াদের ধর্ম প্রচারের অন্যতম ক্ষেত্রভূমি বলে বিবেচিত। এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান বলে ইসলামী মূল্যবোধ এদের অন্তরে বেশি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কাজেই, এ বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী আকীদার প্রতি বিশ্বাসী থেকে জগতের সব জিজ্ঞাসা ও সব সমস্যার সমাধানে ইসলাম নির্দেশিত পন্থার অনুসন্ধান চালায়। পবিত্র *কুরআনে* উল্লেখ আছে, 'আমি আপনাকে (মহানবি স.) পাঠিয়েছি মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে, যাতে পথহারা মানুষ পথ খুঁজে পায়' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৪:২৭ এবং ৩৯:২১; সূরা আল মায়েদা, ৫: ২০)। আর মহানবী (স.) এর আদর্শ এমন এক সর্বব্যাপী কালজয়ী আদর্শ যা মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত কখনো যার আবেদন লোপ পাবে না। বিশ্ব যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করছে ততই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাহ্যত কুরআন ও মহানবী (স.) এর সুন্নাহ'য় আধুনিক এ সব বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকলেও এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত তাতে রয়েছে যার দ্বারা গোটা বিশ্ব উজ্জীবিত হয় কুরআন ও মহানবী (স.) এর সুন্নাহর আলোকে; ঈমান ও আমলের এক স্বত:স্ফূর্ত ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে। ইসলামে এ প্রক্রিয়াকে 'ইলমে তাসাউফ' বলে বিবেচনা করা হয়। ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই মতের কার্যকারিতা ইসলামকে কালজয়ী ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে এ আশাবাদ আমাদের সকল মুমিন মুসলমানের (Dasgupta ৩৩-৩৯)।

বাংলাদেশের এমন কোন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে বেশ পুরোনো পীর আউলিয়াদের মাযার বা মসজিদের অস্তিত্ব নেই। আর এসব পুরোনো জীর্ণ-শীর্ণ মসজিদ বা মাযার প্রমাণ করে যে এদেশে পীর-দরবেশ বা সুফিদের অবাধ যাতায়াত ছিল। এদেশের সর্ব পশ্চিম প্রান্ত থেকে সুদূর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত সর্বত্রই পীর, ফকির, আউলিয়া ও সুফি সাধকদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মত। এ সকল সুফি- দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের ভিত্তি হিসেবে অনুন্নত গ্রামগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন এবং এসব নিভৃত গ্রামগুলোতে বিচরণ করে ইসলামের বাণী প্রচারে ছিলেন অধিক যত্নবান। সুফি প্রভাব শুধু সাধারণ জনগণের উপরই পড়েনি, বরং এর প্রভাব ভবঘুরে ভিক্ষুক থেকে শুরু করে রাজ্যের বাদশাহের প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (চট্টোপাধ্যায়

৪৯)। শত শত লোক প্রতিদিন পীর, দরবেশ, সুফিদের মাযার যিয়ারত করে। সুফিদের প্রভাব শুধু তাঁদের জীবদ্দশাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং সুফি-সাধকদের ইন্তেকালের পরও তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রভাব বাঙালির মনে রেখাপাত করেছে। এ প্রভাবই বাঙালিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করতে অধিক সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে, কাজকর্মে, ইসলামী ভাবধারায় সুফি নির্দেশিত মত ও পথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি সুফিদের বিশ্বাস অকাট্য। আধ্যাত্মিক শক্তির এ বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহপ্রেমে আকৃষ্ট করে সাধারণ মানুষকে সুফি-সাধকের কাতারে নিয়ে যায়। তাছাড়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে-মানুষে সহমর্মিতা গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সুফি দর্শনের অন্যতম দিক। এ দর্শন এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে এ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। যদিও বাংলাদেশে সুফিরা কখনো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে আবার কখনো অত্যাচারী শাসকদের রোষানলেও পড়েছে। এতদসত্ত্বেও এ দর্শন মুখ থুবড়ে না পড়ে বরং স্ব-মহিমায় ভাস্বর হয়ে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রবন্ধে অনাড়ম্বর, বিলাসী জীবন পরিহার এবং ইহজাগতিক অনাসক্তির প্রতীক 'সুফি'দের প্রভাব বাঙালির সমাজ জীবনে কতটুকু ছাপ ফেলেছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। সুফিদের সমাজ ভাবনার ফলে ব্যক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শনচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সূচিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে; যা এ দেশ ও জাতির সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। সুফিগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা গবেষণার দাবী রাখে। যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে সুফি নির্দেশিত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুফি দর্শন অনুশীলনে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহর অঞ্চলের মানুষের মনে যে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং সে উন্নয়ন যে দেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তারও একটি মূল্যায়ন রয়েছে এ প্রবন্ধে।

সুফি-সাধকগণ এমন একটি মানবিক ও প্রীতিময় সমাজ উন্নয়ননীতি গ্রহণ করেছিলেন যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রকৃত অর্থে কল্যাণকর চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল স্বপ্ন ও আকাঙ্খা যথাসম্ভব রূপায়িত আছে। আমাদের বিশ্বাস, সুফিদের দেখানো নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে মানুষ যদি অনাসক্ত জীবনের মাঝে মহা আনন্দ খুঁজে পাবার প্রয়াসী হয় তাহলেই কেবলমাত্র ইসলামের এই 'তাসাউফ' ব্যবস্থা দেশ, সমাজ ও জাতির পারমার্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এভাবে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এমনকি সমাজ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটবে বলে আমরা আশা করি। মানুষ সুফিদের নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শান্তির চূড়ায় (আল্লাহ প্রেমে বিভোর) পৌঁছাতে পারে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া, বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে সুফি দর্শন যে মানুষের মনে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে পারে এ দিকটিকে বিবেচনায় নিয়ে সুফি দর্শনের মূল ভাবনাগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়:

- মানুষের মনে আল্লাহ প্রেম সৃষ্টি করা;
- সকল মানুষকে মানবতা, ধৈর্য্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা;
- জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা;
- সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে সমাজ শান্তির আবাসস্থলে পরিণত হতে পারে তা উদ্ভাবনে কার্যকর পন্থার নির্দেশ দেয়া;
- সুফি নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে কীভাবে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জিত হতে পারে তা তুলে ধরা;

- সুফিদের ন্যায়, সুনীতি, সত্যনিষ্ঠা, কল্যাণবোধ ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব গুণ কীভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তা তুলে ধরা এবং
- সৃষ্ট মানুষ ও মহান স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সুফি নির্দেশিত পন্থার অনুসন্ধান চালানো (Hoque ২৭-৩৫)।

মানুষের মানবিক ও নৈতিক চেতনার উন্মেষে সুফি নির্দেশনাসমুহ যে শুধুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্তা বহন করে তা-ই নয় বরং মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেমের প্রধান সহায়ক হিসেবেও কাজ করে। সমাজকে গতিশীল ও কার্যকর করা; সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে সুফি ভাবধারা দেশের সকল শ্রেণির সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বলা যায়, দেশের সকল শ্রেণির মানুষের সামাজিক জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের কাঙ্খিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা যোগানোও সুফি কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত। সুফিগণ কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার বা পরম সৃষ্টিকর্তার প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই তাঁদের কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং সাধারণ মানুষের আত্মিক শান্তি ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি যেমন সজাগ দৃষ্টি দিতেন তেমনি সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এমনকি শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ছিলেন বেশ সচেষ্ট। এঁরা মানুষকে শান্তির বার্তা দিয়ে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে মানব জাতিকে আহ্বান করে নূরের দিকে পথ দেখান (আরো দেখুন-আল-কুরআন, ২৪ঃ৩৫)।

১.৬. সুফিদের কর্ম ও দর্শনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে জিজ্ঞাসাঃ

সুফি-সাধকদের কর্ম ও জীবন দর্শনের মধ্যে রয়েছে মানব জাতির কল্যাণের মহামন্ত্র (Shah ৬৩-৩৯)। সুফি ভাবধারা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ লোভ-লালসা, কৃপণতা, লোক দেখানো ইবাদত, আত্ম-অহংকার, নিজ ইচ্ছার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মন্দ গুণগুলো পরিহার করে সদগুণ অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি এমনকি আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এভাবে যুগে যুগে সুফিরা ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় শান্তির বার্তা নিয়ে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে গেছেন; জাগতিক সুখ-ভোগ ত্যাগ করে প্রেমময় আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমাহিত হয়ে নিঃস্বার্থ জীবন-যাপনে মশগুল থেকেছেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ৪২১-৪২৭)। সুফিদের কর্ম ও দর্শনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রশ্নসমূহ নিম্নরূপ-

i) সুফিদের দেখানো সমাজচিন্তা ও সমাজদর্শন কীভাবে বাঙালির পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে?

ii) সুফি- পীর- দরবেশ- আউলিয়াদের সৎ, ন্যায়- নীতিবান আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ড কীভাবে আমাদের নৈতিক ভিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সমাজ প্রগতিতে ভূমিকা রাখছে?

iii) সুফিদের মরমী প্রবনতা, অনুধ্যানিক অনুশীলন কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ইসলাম প্রচারে কার্যকর প্রভাব ফেলছে?

iv) একনিষ্ঠ সাধনাবলে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিবিড়তম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে সুফিরা কীভাবে আধ্যাত্মবাদী কর্মকাণ্ড করে চলছেন?

v) সুফি ভাবধারা কেবলমাত্র নির্জন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং এটি কীভাবে আমাদের সমাজ সংস্কারে একটি জীবন্ত আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে?

vi) সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক দর্শনকে ধারণ করে মানুষের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সুফি-সাধক ও আলেম সমাজের তৎপরতা কী?

vii) আত্মার শুদ্ধ অনুশীলনের মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে ঐশী সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি সুফিমতে কীভাবে সম্ভব?

viii) শান্তি তথা বিশ্বশান্তির পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সুফিদের দেখানো নীতি ও আদর্শসমূহের বাস্তবায়ন কী আদৌ সম্ভব? এবং

ix) বিশ্বশান্তির সমস্যার সমাধানে সুফিবাদ কী কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

১.৭. মানবিকতা শিক্ষায় সুফিবাদঃ

সুফিদের মানবিকতার আর্তি, অহিংসনীতি এবং জাত-পাত ভেদাভেদ মুক্ত জীবনদর্শন এ এলাকার নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রভূত সাড়া জাগাতে সক্ষম (লুইস ৩৬-৪২)। মনুষ্যত্ব, সম্প্রীতি, সৌহার্দের অমোঘ বাণী নিয়ে সুফিরা বঙ্গে শান্তির দূত হিসেবেই কাজ করেছেন। সুফি প্রভাবেই বাঙালি সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ-তোষণের বিরুদ্ধে চৈতন্য দেবের হাত ধরে 'বৈষ্ণববাদ' নামে আরও একটি মানবিক ধর্মের বিকাশ ঘটে। বৈষ্ণবদের কাছে প্রেম বা ভক্তি ছিল 'সর্বাত্মক মিলনের' প্রতিচিহ্ন। এই প্রেমবাদের জোরেই বর্ণাশ্রিত ধর্মের ধারক-বাহক ব্রাহ্মণ্যদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের ঘোষণা ছিল-

"বৈষ্ণবদের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে।"

এরকম অভিব্যক্তি মনুষ্যত্বের দর্শনকেই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং সুফি প্রভাবের বাঙালি ধারাটি সমকালীন বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি আদর্শ হতে পারে। মানুষ যখন ষড়রিপুর জটিল-কঠিন বলয় থেকে কঠোর ধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা নিজেকে অবমুক্ত করতে পারে, তখন তিনি সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেন সাধারণ মানুষ বা আধ্যাত্মিক মানুষরূপে; এঁরাই হলেন আধ্যাত্মিক সাধক বা সুফি, যারা ছিলেন উদারনীতির ধারক ও বাহক। সমকালীন বিশ্বশান্তির আরেকটি শর্ত হলো ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্যতা নিরসন। প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপুষ্টি, অখাদ্য, নিম্নমানের খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বজনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (WHO) ৯৩ টি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতার যে তালিকা তৈরি করেছে তা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম দূর্বিষহ অবস্থার মুখোমুখি আজ বিশ্ব সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গে সুফি আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রথম যে শর্তটির উপর তারা গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো এ অঞ্চলের অনাহারে, অর্ধাহারে থাকা মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা। 'খানকাহ' ছিল এ খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রস্থল। অনাহারে, অর্ধাহারে থাকা মানুষের খাদ্যের যোগান দেবার জন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। সুফিদের এ প্রচেষ্টা সমকালীন পৃথিবীর শান্তি অন্বেষণে ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নীতিবোধ, শ্রেয়বোধ, মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যম হিসেবে সুফিবাদ এ অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায় হিসেবে সাম্য, সমতা ও পক্ষপাতহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের নিশ্চিত জীবন-যাত্রার প্রতিশ্রুতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্বটি কেবল সুফিদের দেখানো পূণ্যতর জীবনচর্চার ও মননশীলতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব (Sharif ১৯-২৬)।

১.৮. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সুফি প্রভাবঃ

বাংলার আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা সুফি দরবেশদের খানকাগুলো ছিল সাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি, ধর্মীয়চর্চা এবং মানব কল্যাণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এগুলো বাংলার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সুফিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলার হিন্দু সামাজেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুফিদের প্রভাবে যখন অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলো, তখন বাংলার আকাশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সুফিদের ন্যায় 'একেশ্বরবাদনীতি'তে আস্থাশীল হয়ে মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করেছেন (সূরা মুতাফফিকীন, আয়াত-৩:১৩; ৬:২; সূরা আনকাবুতে, ২৫:৬৯)। সুফিরা আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি মানবকল্যাণ তথা সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন। এঁরা এদেশের দুস্থ, পীড়িত, নির্যাতিত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন, নিরাশ ও মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করেছেন ও ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। সুফি-সাধকগণ খানকা শরীফ নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে আজও তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে দু'একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বিস্তৃত সুফি দরবেশদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। তাঁরা খানকার পাশে মসজিদ বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষদেরকে ধর্ম শিক্ষায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছেন আলম, (শফিকুল ১১১-১২৩)। খ্যাতিমান হানাফী ফকির ও সুফি-সাধক কাযী রুকনুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণেকে ধর্ম শিক্ষায় দীক্ষা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এছাড়াও শাহ মখদুম রূপোস, হযরত শাহ দৌলা, হযরত শাহ জালাল(র.), হযরত শাহ পরাণ(র.) প্রমুখ এতদঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা স্থাপন করে হিংসা, দ্বেষ, নৈরাজ্য, শোষণ-বঞ্চণা এসব কিছুর বিপরীতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মগ্ন থেকেছেন। পরম শান্তির লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন জাগতিক শান্তিকে পাকাপোক্ত করা। আর জাগতিক শান্তির পথ ধরেই আসে পরম শান্তি। ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকশিত বাস্তবতা 'মূল্য ও আদর্শ' এ শান্তির পথেই ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং শান্তি, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা- এই তিনটি মাত্রা সুফিবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বলে এ আদর্শ হতে পারে সমকালীন বিদ্বেষ ও অশান্তি নির্মূলের প্রধান হাতিয়ার যা অনুসরণে আল্লাহর কৃপা লাভ করা সম্ভব (আরো দেখুন-আল কুরআন ৩ ঃ ১৩২-১৩৪)। কথিত আছে যে, শাহ মখদুম রূপোস এ অঞ্চলের এক হতভাগা পিতাকে অর্থ সহায়তা করে তার সাতটি কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন।

হযরত শাহ সুফি আবদুল লতিফ চট্টগ্রামের আমানটুলী গ্রামে বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। হযরত শাহ সুফি তাজ ইসলাম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে এতিম ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার উপকরণ সরবরাহসহ যাবতীয় খরচ বহন করে গেছেন। হযরত মাওলানা শাহ সাহেব একজন প্রখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। আজীবন তিনি আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি বিড়াল কুকুরের মতো নীচু প্রাণিকেও আহার দিয়ে সেবা করতেন (মজিদ ১৮-২৬)। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় শতাধিক অনাথ ও দরিদ্র বৃদ্ধার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে গেছেন। পাক-ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন সুফি-সাধক আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি এলাকার দরিদ্র, বিপন্ন, অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব অনটনে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমাজ সেবায় অবদান রেখে গেছেন। কোনো কোনো সুফি এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বড় পীর শাহ সুফি হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) আধ্যাত্মিক কাজ-কর্মের পাশাপাশি দুঃস্থদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কথিত আছে যে, তিনি এলাকায় মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁর শিষ্যদের

মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর উদার মহানুভবতার কথা আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সুফি-সাধক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। অনেকে পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন (Macdonald ৮১-৮৭)। গবীর, দুঃখী মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য কোন কোন সুফি বিভিন্ন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ, সেচ প্রকল্পের অনুমোদন, টেইলারিং, হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কার্পেটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বুক বাইন্ডিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুফি-সাধকগণ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাঁদের অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছেন (সাকলায়েন ১৯-২৯)।

সুফিবাদ শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে। বিগত দুইশ' বছরের দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব না হলেও সুফি ও তাঁদের অনুশীলনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। সামাজিক জীবনে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার আকাঙ্খাই পোষণ করে না। দার্শনিক চিন্তার বিবর্তনে অস্তিত্ববাদী প্রয়াস এ কারণে দাবী করে:'বেঁচে থাকা' (to live) এবং 'অস্তিত্বসম্পন্ন হওয়া'(to exist) এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানেই নিম্নতর প্রাণির সাথে মানুষের পার্থক্য স্পষ্ট। মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না, তার মধ্যে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা; স্বাধীনতা ভোগ করবার অপার বাসনা, ভালো থেকে মন্দকে বিচার করার ক্ষমতা, পছন্দ করার অভীপ্সা ইত্যাদি এবং এসবের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে। সুফিবাদও তার সমস্ত দার্শনিক প্রয়াসের মধ্যে, কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে দায়িত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তর করতে চায়। দার্শনিক নীটসে, হাইডেগারের মধ্যেও সুফি জীবন দর্শনেরই অনুরণন লক্ষণীয়। হাইডেগার বলেন, মানুষ পবিত্র হয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু সামাজিক লোভ-লালসা তার আদি অবস্থা থেকে স্খলন ঘটায়, এই অনৈতিক মানুষকে তিনি বলেছেন স্খলিত মানব (will-to live-well), আর এই বাস্তবতাকে বলেছেন 'ডেজাইন'। সুফিদর্শন আমাদেরকে এই ডেজাইন বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ করতে চায় (Hai ২৯-৩৫। এ কারণে সুফিবাদ ক্ষমতার বহুমুখী আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষকে মুক্ত রেখে আধ্যাত্মিক শান্তির পথ সুগম করে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পন করে (আরো দেখুন-সূরা আল-মুমিন, ৪০:১৬)।

১.৯. সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান ও কবিতায় সুফি প্রভাবঃ

সুফি-সাধকগণ আকাঙ্ক্ষার প্রভুত্ববাদী দিকটিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সহনশীলতা, সংযম ও শান্তির বাণীকে মননে, যৌবনে ও সমাজে পরিব্যপ্ত করতে চেয়েছেন। সুফিদের জীবন-যাপন প্রণালী, চিন্তা ভাবনার মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। বাংলার মাটিতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফি দরবেশদের ভূমিকা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠার ফলে সুফি দরবেশদের চারিত্রিক গুণাবলী ও তাঁদের মানবতাবাদী কল্যাণকর কর্মকাণ্ড গোটা সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুফি প্রভাবের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার কার্যকরী প্রভাব দেখা যায় মূলত পঞ্চদশ শতকের পর থেকে। এ সময় থেকে বাঙালি সমাজ সুফি ভাবধারাকে গ্রহণ করে সাহিত্যের বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে, লোক সাহিত্যে এ প্রভাব ছিল অনেক বেশি। কারণ তাঁরা ক্ষেত্র বিশেষ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের মাযার ও খানকাসমূহ ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের কেন্দ্রস্থল। বাংলা সাহিত্যের চারটি ধারায় সুফি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো– মুর্শিদি, বাউল, পুথি ও শামা। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাবমুক্তিকে সুফি প্রভাবের ফসল বলে মনে করেন (চট্টোপাধ্যায় ৬৭)। এছাড়াও তিনি বৈষ্ণব কবিতার গল্প কাহিনীর সাথে সুফি কবিতায় ব্যবহৃত গল্প কাহিনীর সাদৃশ্য তুলে ধরেন। একথা অনস্বীকার্য যে, সুফি দর্শনের প্রভাবেই বাংলা কাব্যে মানবতাবোধের জন্ম। বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা মানুষের মনে

প্রাণে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তা-ও তিনি পেয়েছেন মূলত ইসলামী সংস্কৃতির ভাবাদর্শে। শুধু চণ্ডীদাশই নন বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মধ্যযুগের পদাবলী প্রভৃতিতে সুফি-সাধকদের ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী চিন্তারীতি ও ভাব তরঙ্গের মিশ্রণে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটে।

সুফি সাধকদের গান বা কবিতা বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তাঘাটে যেসব যানবাহন চলাচল করে সেসব যানবাহনে প্রায়শই মাইজভাণ্ডারী, মোহছেন আউলিয়া প্রমুখ সুফি দরবেশদের উপলক্ষ করে অনেক ভক্তিগীতি ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বাজাতে শোনা যায়। এছাড়াও বাংলার অলিতে-গলিতে, পথে-প্রান্তে, রাস্তার পাশে ছোট ছোট চায়ের দোকানসহ প্রভৃতি জায়গায় অনুরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধার গান শুনতে পাওয়া যায় (আবদুর রহীম ১১৩-১২১; ২২৯-২৩৭)। এসব গানের ক্যাসেট সি. ডি. আকারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এসব মন মাতানো গান ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে রেখাপাত টেনে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। উল্লেখ্য যে, সুফিদের এ আধ্যাত্মিক গান যদিও আরবীয় পীর দরবেশ, সুফি-সাধকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্ভব তবুও এর প্রভাব পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুফিরা আল্লাহ ও নবী প্রেমের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতে চান। তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদনীতি ও আদর্শ, জগতের ক্ষণিকত্ব এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি শর্তহীন ভালোবাসায় নিজেকে সমর্পন করে তদানুযায়ী সাধারণ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটিই, আর তা হলো ইসলামের মূল বাণী প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন ঘটানো। এভাবে সুফি দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষ যেমন দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল তেমনি পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন তরিকার অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদ গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, সুফিদের জীবদ্দশায় তাঁদের খানকাসমূহ এবং মৃত্যুর পর তাঁদের মাযারসমূহ আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয় এবং সুফিদের নিয়ে লেখা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতসমূহ জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এসব গান ও কবিতা এ অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র শ্রদ্ধাভরে বাজানো হয়। এসব মন মাতানো গান এ অঞ্চলের জনসাধারণের উপর সুফি-সাধকদের ব্যাপক প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১.১০. রাজনৈতিক অঙ্গনে সুফি প্রভাবঃ

বর্তমান বিশ্বে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করে নেবার লক্ষ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। এরপরও আমরা আরো অধিক পাবার বাসনায় নিজেকে, সমাজকে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে তথা বিশ্বকে অস্থির করে তুলছি। গাণিতিক অসীমতার মতো এ অস্থিরতা চলছে। সুফিবাদ এ অশান্তির মাঝে দাঁড়াতে পারে শান্তির বাণী নিয়ে (Macdonald ৮১-৮৭)। কারণ জীবনে প্রথাগতভাবে এগিয়ে যাবার নিয়ম-কানুনকে সুফিরাই প্রথম ঘুরিয়ে দিয়েছেন। প্রথাগত কানুনসমূহ আমাদেরকে ক্ষমতালিপ্সু করে তোলে। অবিরাম উর্ধ্বমুখী আকাঙ্ক্ষার দিকে ছুটে চলার মনোবৃত্তি তৈরি করে, অর্থবিত্ত, সমৃদ্ধি এবং অর্জনকেই মনে করে জীবনের একমাত্র পাথেয়। এজন্য সুফি সাধকগণ তাঁদের কর্ম, নির্দেশনা এবং তত্ত্বের মধ্য দিয়ে জীবনের এই প্রথাগত স্বভাবকে প্রত্যখ্যান করে জীবনকে সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। সুফিগণ আকাঙ্ক্ষার এ প্রভুত্ববাদী দিকটিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সহনশীলতা, সংযম ও শান্তির বাণীকে মননে, যৌবনে ও সমাজে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। সুফিদের জীবনযাপন প্রণালী, চিন্তা ভাবনার প্রতিচ্ছবি আজকের বাংলাদেশের অনেক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সুফিদের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণমুখী চিন্তাভাবনার জন্য ধনী-দরিদ্র, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী আজও তাঁদের দরগাহ শরীফে সমবেত হয়ে স্রষ্টার কাছে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য প্রার্থনা করে।

সুফিরা রাষ্ট্র ক্ষমতা বলতে পুঁজিপতি রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেননি (Ali ১১৩-১২১; ২২৯-২৩৭)। বরং তাঁরা যে 'ইনসানুল কামেল' বা পরিপূর্ণ মানুষ যারা ক্ষমতার রোগে আক্রান্ত মানুষ নয়। সুফিদের এই মানুষ হলো 'পূর্ণমানব'। দার্শনিক নীটশের সুপারম্যান সেই একই অর্থ বহন করে। কিন্তু সমকালীন বিশ্ব তথা মুসলিম সম্প্রদায় যে ইসলাম চর্চা করেছেন তাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ক্ষমতার বিকারগ্রস্ত রুগ্নতা। এই রুগ্নতাকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থায় শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারি। সুফিরা এই রুগ্নতা প্রত্যাখ্যানে সমর্থ হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে গেছেন। নীটশের এ দর্শন ভাবনার সাথে মিশেল ফুঁকোর সুফিতাত্ত্বিক দর্শন ভাবনার সম্পর্ক রয়েছে। সুফিদের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে দেখেছেন 'মানসিক ও মানবিক বিকারের প্রকাশ' হিসেবে। সুফি-সাধকদের প্রভাব শুধু সমাজের সাধারণ জনগণের উপরই পড়েনি, বরং এঁদের প্রভাব কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এমনকি রাজনীতিবিদদের উপরও পড়েছিল ব্যাপকভাবে। ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, এদেশে মুসলিম রাজত্ব স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর; কিন্তু তা সত্ত্বেও সুফি-সাধকগণ কখনো মুসলমান সেনাপতিদের সহযোগিতা করে আবার কখনো নিজেরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করে গেছেন (Nicholson ১০৩-১০৯)। এঁদের মধ্যে বাবা আদম শাহ (র), তুর্কান শাহ (র), শাহ মখদুম রূপোস (র.), গাজী শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (র.), হযরত শাহ জালাল (র), হযরত খান জাহান আলী (র), সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক (র.) প্রমুখ সুফি-সাধক হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে স্ব-স্ব অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সুফি-দরবেশগণ এ অঞ্চলে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করে সুফিরা তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র বিস্তারে অনেকটা সফল হয়েছেন (শামসুর ৬৯; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড-১ ও ২, পৃ. ৬৪-৬৭; ৫৪-৫৮)। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সুফি-দরবেশদের প্রভাব শুধু ধর্ম প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁদের কার্যকলাপ রাজনৈতিক অঙ্গনেও বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। সুফি-সাধকদের জীবন সাদাসিধে ও সহজ সরল। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তবে রাষ্ট্রের যখনই দুঃসময় এসেছে সুফিরা তখন ইসলামের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি, অভিভাবকরূপে মুসলিম শাসকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেমন, হযরত নূর কুতুব আলম (র.) ইলিয়াস শাহীর শাসনামলে রাজা কংসের নির্যাতন থেকে পীর, দরবেশ, উলামা মাশায়েখদেরকে রক্ষা করার জন্য বিশিষ্ট সুফি-সাধক ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এমন দুর্দিনে তিনি মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বলে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ এক মহাসংকট থেকে রক্ষা পায় এবং মুসলিম সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে নব শক্তির সঞ্চার হয় ও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হয় (আহসানউল্লা ৯-১৪)।

সুফি-সাধকদের খানকা হিসেবে পরিচিত সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র) এর মাযার শরীফ, খুলনার খান জাহান আলী (র) এর দরগাহ শরীফ, রাজশাহীর শাহ মখদুম (র) এর মাযার শরীফ ও শাহ দৌলা (র) এর মাযার শরীফ, চট্টগ্রামের হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (র) এর মাযার শরীফ ও আনোয়ারা থানার তালসরা দরবার শরীফে এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট রাজনীতিক, কূটনৈতিক প্রমূখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং বর্তমানেও তা প্রচলিত আছে। এসব দেশ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের পদচারণাই প্রমাণ করে যে, এদেশের সুফি-সাধকগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাঙালি জাতির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন (রশীদুল ১৫-২৯)। এঁদের আদর্শ এ জাতির আশীর্বাদস্বরূপ। কাজেই বলা যায়, বাংলার সুফি-সাধকগণ শুধু ইসলাম ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী স্বার্থসংরক্ষণে দেশের রাজনীতিতে নিজেদের

যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুতরাং এটা দিবালোকের মত সত্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তার ও সংহতিতে সুফি-সাধাকগণ নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন যা অনস্বীকার্য (সোবহান ১৯-২৭)।

বস্তুত বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকাল থেকেই সুফি ভাবধারা এদেশে প্রবেশ করেছিল বটে, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর সময় থেকে সুফি ভাবধারা এদেশে পূর্ণগতিতে চলতে থাকে। এছাড়াও এ সময়ে এতদঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তারের ফলে এ মরমী চিন্তাধারা আরও ত্বরান্বিত হতে থাকে। মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সুফিরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উগ্রতা থেকে নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু ও বৌদ্ধসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সুফি-সাধক, পীর-দরবেশ ও আলেমদের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য (মুহাম্মদ নূরুল ও অন্যান্য ১০৬-১০৯)। সুফিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে সুফিবাদের বীজ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে থাকে। ইতিহাস বিবর্তনের যে যুগে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা হতো আরবী ভাষায়, তখন থেকেই মারেফাতে ইলাহিয়া তথা আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা ও তাসাউফের চর্চা পুরোদমে চলতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় যেকোনো সমস্যা সমাধানে সুফিদের প্রভাব ছিল অন্যান্য যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি (Pradip ৯৯-১০৭)।

১.১১. অলৌকিক কর্মকাণ্ডে সুফি প্রভাবঃ

সুফি-সাধকদের কাজকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এঁরা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালান (*http//www: encyclopedia of religion and ethics,* vol- vi; part-ii <sufigeoethics.com>)। মানুষের নানা বিপদে-আপদে তাঁরা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিপদগ্রস্ত মানুষ সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার পর সুফিদের প্রতি তারা আরও অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে (Enamul ১০৬-১০৯)। এভাবে সুফিদের খ্যাতি ও প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। সুফিগণ নৈসর্গিক এ লীলাভূমিকে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক পীর, ফকির, দরবেশ এদেশে এসে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া আগত সুফি-সাধকদের অনেকেই অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণের বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ আছে যে, দেশে যখন কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দিত; কিংবা যখন দেশে অনাবৃষ্টি, প্রখর রোদে দেশের শস্য ধ্বংসের কাছাকাছি ঠিক এমন মুহূর্তে সুফিগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন দূর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য। মুহূর্তেই আল্লাহতায়ালা বৃষ্টি দিয়ে সমগ্র যমিন ঠাণ্ডা করে দেন (সাইয়েদ (অনূদিত) ২; ১৯-২৬)। এসব আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের মনে সুফি-সাধকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়। সুফিদের জীবন-প্রণালী তথা বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সবটুকু প্রমাণসিদ্ধ না হলেও এটুকু বলা যায যে, সুফিদের আশীর্বাদ লাভের জন্য সাধারণ মানুষ সুফিদের মাযার বা খানকা শরীফে ভিড় জমাত। শুধু মুসলমানরাই নয় বরং অনেক অমুসলিমরাও এ আশীর্বাদের ছায়াতল থেকে বাদ পড়েনি। সুফি দর্শন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশ্বাসী থেকে মানুষকে প্রেমের পথে পরিচালিত করে স্রষ্টার জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন (*http//www: encyclopedia of islam and religion,* vol- iii; part-iii <sufibangla.com>)। প্রসঙ্গত, একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। শাহ সুফি হযরত আবদুল খালেক গজনবী ওরফে চাল-ডাল মিঞা (র) সম্পর্কে জানা যায়, তিনি সুদূর গজনী থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকায় আস্তানা তৈরী করেন। তিনি ছিলেন শরীয়ত ও তরিকতের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি যখন মসজিদে বসে যিকির করতেন তখন বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর সাথে যিকিরে শরীক হতেন। চাল ডাল মিঞা সকাল বেলা এক হাড়ি (জগ) পরিমাণ

চাল-ডাল রান্না করতেন। কথিত আছে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে মানুষ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকুক না কেন সেই নির্দিষ্ট পরিমান রান্না করা চাল-ডালে সবাই তৃপ্তিসহ খাবার খেতে পারতেন, খাবারের কোন ঘাটতি হতো না। এতদঞ্চলের মানুষ তাঁর এ অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে তাঁকে চাল-ডাল মিঞা উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমানে তাঁর মাযারে বহু লোক প্রায় প্রতিদিন মানত, মিলাদ ও মাহফিলের আয়োজনসহ তাঁর মাযার যিয়ারত করেন (মনোয়ার ৩৯; আবদুল ১৭-২৬)।

১.১২. উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনার সংক্ষেপ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে ইসলাম প্রচারে বহু দেশি-বিদেশী পীর-দরবেশদের কর্মতৎপরতা ও তাঁদের মহান জীবনাদর্শ সম্পর্কে কিছুটা হলেও প্রবন্ধটি তথ্যের খোরাক যোগাবে। পীর, দরবেশ, সুফি-সাধকদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করছেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে। মানুষ এঁদেরকে অনুসরণ করবে, সৎ পথে চলবে, যিকিরে মশগুল থাকবে ফলে মানুষ যাবতীয় অন্যায়, ব্যভিচার, পাপ কার্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এভাবে সুফি ভাবধারা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ ইহকালের যাবতীয় পাপ কার্য থেকে মুক্ত হয়ে পরকালের স্থায়ী শান্তি পেতে পারে। নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণের দিক থেকে সুফিকে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উঁচু স্তরে উন্নীত হতে হয় এবং অর্জন করতে হয় সূক্ষতর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অনুভব শক্তি। সর্বোপরি, সুফি-সাধকগণ তাঁদের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তথা সমগ্র মানুষের জন্য যে শিক্ষার কথা বলেছেন, তার ভাবার্থ হলো– (১) পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধ মান্য করা, (২) রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নতের অনুসরণ করা, (৩) হালাল খাবার খাওয়া, (৪) কাউকে কষ্ট না দেয়া, (৫) পাপ কাজ হতে বিরত থাকা, (৬) তওবা ইস্তিগফার করা, (৭) আল্লাহ ও বান্দার হক যথাযথ আদায় করা (*http//www: encyclopedia of religion <internationalsuficentre.org>)*। সুফিদের এ শিক্ষা তাঁদের শিষ্যদের উপর পড়েছিল ব্যাপকভাবে। সুফিদের এ শিক্ষার ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ভূ-খণ্ডে ইসলামী শিক্ষা তথা তাসাউফের শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা আন্তর্জাতিক জীবনে যে অসভ্যতা, অনাচার, ব্যভিচার, অনৈতিকতা বিরাজ করছে তা মূলত ঐ আদর্শ-বিচ্যুত জীবন-যাপনেরই প্রতিফলন। সুতরাং এ রকম আত্মপোলব্ধির প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আঞ্চলিক শান্তি তথা বিশ্বশান্তির জন্য সুফিবাদ হতে পারে একটি 'রোল মডেল'।

তথ্যসূত্র

Dasgupta, Shashibhusan. *Obscure Religious Cults.* Calcutta: Firma K. L. M. Ltd., 1946।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।* মিতা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

Hoque, Mohammad Enamul. *A History of Sufism in Bengal*. Dacca: Asiatic Societ of Bangladesh, 1975।

Shah, Iqbal Ali. *Islamic Sufism.* Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1998।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড। ইসলামীক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

মেশিগনন, লুইস. *"তাসাউফ"।* ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড। ইসলামীক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯,।

Sharif, M. M. *Muslim Thoughts: Origin and Achievements.* London: University Books, 1959।

আলম, এম. শফিকুল। *বাংলাদেশ দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।* নকসা প্রকাশন, ২০০৭।

মজিদ, আবদুল। *শরীয়ত ও তরীকত* (অনূদিত ও সংকলিত)। এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১৯৯৭।

Macdonald D. B. *Muslim Theology.* London: Blakie, 1962।

সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলাদেশের সুফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৯-২৯।

Hai, S. A. *Muslim Philosophy*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1964।

হাযারী, আবদুর রহীম। *সুফীতত্ত্বের আত্মকথা।* নবরাজ প্রকাশনী, ১৯৮৮।

Ali, Syeed Ameer. *The Spirit of Islam,* London: BlaKie, ১৯৬১।

Nicholson, R. A. *The Mystic of Islam,* London: London Books House, 1963।

রহমান, শামসুর। *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো।* নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৬৮।

আহসানউল্লা, খানবাহাদুর। *সুফী।* আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ১৯৯৬।

আলম, রশীদুল। *সূফী সাধনার ভূমিকা।* সাহিত্য কুটির, ১৯৮৬।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা- বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আমিন, মুহাম্মদ নূরুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম।* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

Lahari, Pradip. *Bengali Muslim Thought 1818-1947.* Calcutta: K. P. Bagchi and Co**.,** 1991।

দেখুন, *http//www: encyclopedia of religion and ethics,* vol- vi; part-ii <sufigeoethics.com>

হাই, সাইয়েদ আবদুল (অনূদিত)। *ইসলামী ভাবধারা।* পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ১৯৭০।

দেখুন, *http//www: encyclopedia of islam and religion,* vol- iii; part-iii <sufibangla.com>

সাগর, মনোয়ার। *সীতাকুণ্ডের ইতিহাস : সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।* **জব্বার, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল।** *এলমে তাসাউফের হাকীকত*। বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯২।

দেখুন, *http//www: encyclopedia of religion <internationalsuficentre.org>*